স্মৃতির পুজো

শ্রীপান্থ

প্রকাশ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বড়ো কাগজের পুজো সংখ্যায় লেখার সুযোগ হয়েছে অনেকবার। লিখে আনন্দ পাইনি, তা নয়। বড়ো কাগজের প্রচার সংখ্যা বেশি, সুতরাং, পাঠকও নিশ্চয় অগণিত। তাঁদের একাংশের কাছে পৌঁছানোও নিশ্চয় মস্ত সুযোগ। তবু বলব, ছোটো কাগজে লেখার আনন্দই আলাদা। বিশেষত, লেখকের যদি জানা থাকে সম্ভাব্য পাঠক কে বা কারা, কিংবা সংখ্যায়ই বড়োজোর কত জন! তার চেয়েও ভাবতে ভালো লাগে এ-পাঠকরা অনেকেই আমার চেনা। হাটে-বাজারে, পথে, ব্যাংকে, পোস্ট অফিসে, ডাক্তারখানায়—প্রতিনিয়ত যাঁদের দেখে থাকি, দেখে থাকি পুজো-মণ্ডপেও—তাঁরাই নিশ্চয় নাড়াচাড়া করেন পাড়ার-এই ছোট্ট স্মারকপত্রটি। সে এক অন্য ধরনের অনুভূতি।

দুই দশক আগে প্রথম যখন আমরা পাড়ায় আসি তখন প্রাক্-পরিচয় ছিল মাত্র দু'তিনটি পরিবারের সঙ্গে। পরে ক্রমে পরিচিতের পরিমণ্ডল সম্প্রসারিত হয়েছে, অনেকের সঙ্গে হয়েছে অন্তরঙ্গতাও। ফলে যত ব্যস্ততাই থাক, প্রতি বছরই পল্লীর এই ছোট্ট, সংকলনটিতে লিখেছি নিয়মিত। মাথায় আর লেখার মতো কিছু নেই যখন, তখনও মগজের আনাচে কানাচে খোঁজাখুঁজি করে অকিঞ্চিৎকর কিছু কুড়িয়ে নিয়েও লিখেছি অনেক সময়। তবু লিখেছি। এ লেখার ভূত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিনি কোনওদিন। কেউ কেউ আগ্রহ দেখালেও উৎসাহবোধ করিনি। এবার অবশ্য কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও সায় দিতে হল। জানা ছিলনা নিঃশব্দে আমাদের জামাতা সুবীর দত্ত নিয়মিত সঞ্চয় করে রেখেছিলেন পুষ্পাঞ্জলির মতো নিবেদিত এই সব টুকিটাকি রচনা। এমন কি, ছবিগুলো পর্যন্ত। তাঁরই উদ্যোগে অবশেষে এই—ছোট্ট বই। এই উদ্যোগে সানন্দে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নবীন প্রকাশক সন্দীপ নায়ক। ওঁদের দু'জনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীপান্থ

সেপ্টেম্বর, ২০০৩

সূচিপত্র

কলকাতা	১৩
ঘটনা ও রটনা	১৬
স্মৃতির পুজো	২১
প্রবাদের সেই তিন বাড়ি	২৫
আড়ম্বরের আড়ালে	৩১
প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দুর্গোৎসব	৩৪
সাহেবের দুর্গোৎসব	৩৯
বাইজি পুজোর বদলে	৪১
বাবুদের বাড়ি থেকে বারোয়ারি মণ্ডপে	৪৫
বারোইয়ারি নয়, বারোয়ারি	৫০
তখন আর এখন	৫৪
চাঁদা নিয়ে	৫৬
জবরদস্তির পুজো	৬১
পুজো সাহিত্য	৬৫
এক পয়সার পুজো সংখ্যা	৬৭
পুরানো এক পটের ঠাকুর	৭৩
দেবী বিদেশিনী	৭৯
নানা নামে, নানা রূপে	৮২
কলাবৌ	৮৭
মনে পড়ে	৯০
চিত্রসূচি	৯৬

কলকাতা

— কলকাতা, সেদিন কী ছিলে তুমি? গত শতকে প্রশ্ন তুলেছিলে, অ্যাটকিনসন নামে একজন ইংরেজ কবি।

সত্যিই তো, আজকের আলো-ঝলমলে নগরীর অন্ধকার ছাড়া কী সম্বল ছিল তখন আর? অরণ্যের অন্ধকার, দারিদ্র্যের অন্ধকার, অসভ্যতার অন্ধকার! ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশয়, বাঘ-ডাকাত এবং নেটিভে মিলে অরণ্যপুরী কলকাতাকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন সেকালের বিলাতি সিভিলিয়ানরা। কলকাতার নামে গায়ে জ্বর আসত পশ্চিমি সিপাহিদের। রুটির লোভে কলকাতায় আসার চেয়ে দেশে বসে 'মৌহা' খাওয়াও অভিপ্রেত ছিল তাদের কাছে। 'জাল, জুয়াচুরি ও মিথ্যা কথা; এই তিন নিয়ে কলিকাতা'—সুতরাং কলকাতাকে এড়িয়ে চলতে চাইতেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা। ধর্মপরায়ণ শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালির আতঙ্ক ছিল অষ্টাদশ শতকের কলকাতা। কলকাতার 'বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া সেতার এস্রাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি ফুল-আখড়াই হাফ-আখড়াই প্রভৃতি শুনিয়া, —রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটায়।' কলকাতা বাংলাদেশের লজ্জা। সুতানুটি গোবিন্দপুরের ভূতপূর্ব জেলে চাষিরা এখানে পরমানন্দে দাসত্ব করে। ঢাকা ময়মনসিংহ কিংবা মেদিনীপুরের স্বাধীন চাষাভুষার অপমান কলকাতা; শুধু তাই নয়, বন পরিষ্কার হয়ে হয়ে বিপুল জনবসতি গড়ে উঠল যেদিন, ঘরে জ্বলল গ্যাসের আলো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়াল শান্তিরক্ষার্থ পুলিশ —অচলা হয়ে বসলেন নগরলক্ষ্মী — সেদিনও অবশিষ্ট বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অংশের কাছে কলকাতা অরণ্যের শামিল। এখানে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে শান্তিতে সতীদাহ চলে না, তদুপরি এখানে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে বাঙালি ছোকরারা তর্ক করে।

তারা হোটেলে খায়, কোট-প্যান্ট পরে, ডাক্তারি বিদ্যার নামে মড়া কাটে। তদুপরি নিয়মিত স্কুলে গতায়ত করে। এখানে ধর্ম বাঁচে না, কুল রক্ষা করা চলে না।

'খানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল
জাতের দফা হলো রফা থাকবে নাক' কুল।'

ছেলেরা আর তর্কালঙ্কার মশাইয়ের কাছে ঘেঁষে না, 'ফিরিঙ্গি পুঙ্গব' শ্রীমদ ডিরোজিও'র পেছনে পেছনে ঘোরে। কলকাতা অরণ্য নয়তো কী।

তবুও অসামাজিক শহর কলকাতা অনাদরের শৈশব, অবহেলার কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল একদিন। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইঙ্গবঙ্গ, রাজা এবং প্রজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আগলে রইল যৌবনবতী শহরকে। না থেকে উপায় নেই। কলকাতা জাদুর শহর নয়, কলকাতা চার্নকের কীর্তিও নয়, কলকাতা বাংলাদেশের। প্রচলিত রীতি মেনে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী হয়তো আইনসঙ্গত জন্ম এর হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ গর্ভে ধারণ করেছে একে। নিজ রক্ত দিয়ে তিল তিল ধরে পুষ্টিসাধন করেছে শিশু শহরের। প্রকাশ্যে স্নেহ হয়তো দিতে পারেনি লজ্জিতা মাতা, কিন্তু অস্বীকারও করতে পারেনি রক্তের সম্পর্ক। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হলেও স্বাভাবিক জন্ম এ শহরের। তাই সারা বাংলার চোখের সামনেই প্রকৃতির নিয়মে যৌবন এল কলকাতার। অঙ্গে-অঙ্গে তার যুগলক্ষণ।

এল ঊনবিংশ শতক। রেল এল, কল এল, ধান ভানার কল, কাপড়ের কল, ছাপার কল। বসল ছাপাখানা, স্কুল, কলেজ। অবশেষে কলকাতা বিদ্যালয়। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কলকাতাকে অস্বীকার করার শক্তি আর রইল না বাংলাদেশের। পাণিচর্চা ছেড়ে ভাটপাড়া-বিক্রমপুরের পণ্ডিত তনয়েরা মুখস্থ করতে বসলেন—

গড্ ঈশ্বর, লাভ ঈশ্বর — কাম মানে এস
ফাদার বাপ, মাদার মা, — সিট মানে বস।

নাকে চশমা ঝুলিয়ে ছাপার হরফে 'সমাচার দর্পণ' পড়তে বসলেন বিষ্ণুপুর-চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতিরা। সমাচার চাই, কলকাতা সমাচার, কলকাতার সংবাদ। "আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংলন্ড দেশ হইতে বাষ্পের জাহাজ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। — এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে....." ইত্যাদি। প্রতিদিন নতুন সংবাদ। নতুন বার্তা। যুগান্তরের বার্তা। অতএব—

ধন্য কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি....

বলে আত্মসমর্পণ করল বাংলাদেশ কলকাতার কাছে। উনিশ শতকের কলকাতা মশালচি হল সারা ভারতবর্ষের। এই মশালের উজ্জ্বল আলো পতঙ্গের মতো টেনে এনেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানান্বিষ্ট জীবিকা-সন্ধানী মানুষকে। আজও আনছে। কলকাতা আজও বর্ধিষ্ণু। গায়ে গতরে যত না তার চেয়ে মনে মনে। বিধাননগর বা বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি আর কতটুকু? কিন্তু মনে মনে এখনও শহরতলি তো বটেই, এমন কি অন্য প্রদেশের শহরও কিন্তু হতে চায় কলকাতা। কেননা, তারা শুনেছে একমাত্র কলকাতারই রয়েছে মন। অন্যদের কাছে বলতে প্রায়শ শরীরটাই।

ঘটনা ও রটনা

তিনশো বছর আগে ফিরিঙ্গি বণিক জোব চার্নক যখন সুতানুটির ঘাটে নোঙর করেন তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা, এই গ্রাম তিনটির জমিদার ছিলেন বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীরা। চিরকাল আমরা শুনে আসছি ওঁরাই মাত্র তেরোশো টাকার বিনিময়ে এই তিনখানি গ্রাম তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজ সওদাগরদের হাতে। আর, তার জের হিসাবে পরবর্তীকালে এদেশে ইংরেজদের আধিপত্য। বলাবাহুল্য, সাবর্ণ চৌধুরীদের পক্ষে এটা পারিবারিক কলঙ্কের সামিল। ঐতিহাসিক, এবং যাঁরা ঐতিহাসিক নন, তাঁরা সবাই বলতে গেলে প্রায় তিনশো বছর ধরেই বড়িশার ওই বাঙালি পরিবারটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে আসছেন —ওঁরাই একদিন টাকার লোভে সাহেবদের কাছে বেচে দিয়েছিলেন কলকাতা। সে-রটনার এখনও বিরাম নেই। কলকাতার তিনশো বছর উপলক্ষে বিস্তর লেখালেখি চলছে চারদিকে। সেখানেও দেখি মাঝে মাঝে পরিবেশিত হচ্ছে একই খবর, সাবর্ণ চৌধুরীরা বেচে দিয়েছিলেন কলকাতা!

আসলে এটা ঘটনা নয়, রটনা মাত্র। সংবাদ নয়, গুজব। প্রথমত, সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতার জমিদার হলেও সাবর্ণ চৌধুরীদের কোনও অধিকার ছিলনা এই জমিদারি কারও কাছে বিক্রি করার। কারণ, এই জমির মালিক ছিলেন স্বয়ং মুঘল বাদশা। এমনকি বাংলার সুবাদারও ইচ্ছে করলেই এ-জমির স্বত্ব কারও হাতে তুলে দিতে পারতেন না। রাজা মানসিংহের আমলে চৌধুরীরা এই গ্রাম তিনটির জমিদারি পেয়েছিলেন মাত্র, বিক্রয়ের অধিকার নয়। ইংরেজরা যা পেয়েছিল তাও এই জমি-স্বত্ব মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তারা সাবর্ণ চৌধুরীদের বদলে এই তিন গ্রামের জমিদার হয়েছিলেন, এই যা। সেটা ১৭৭৮ সালের কথা। চার্নক সুতানুটির ঘাটে নোঙর করেন ১৬৯০ সনে। আট বছরের মধ্যেই বিদেশি সওদাগরের দল পরিণত হল কলকাতা সহ তিনটি গ্রামের জমিদারে। কেমন করে? রহস্য সেখানেই।

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর —ঘুষের জোরে। দিল্লিতে বাদশা তখন ঔরঙ্গজেব। কিন্তু মুঘল সূর্য তখন অস্তগামী। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন। এমন সময় একদিন বাংলার সুবাদার হয়ে এলেন স্বয়ং বাদশার নাতি আজিম উশ্বান। সেটা ১৬৯৭ সনের নভেম্বরের কথা। শাহজাদা এসে ছাউনি ফেলেন বর্ধমানে। চার্নক তখন মৃত। ইংরেজ সওদাগররা তাকে-তাকে ছিল। তারা অনেক চেষ্টা করেছে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের সঙ্গে বন্দোবস্তে আসতে। কিন্তু চৌধুরীরা কিছুতেই তাদের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় আসতে রাজি নন। তাঁদের এক কথা ঃ সাহেবরা যদি এই এলাকায় থাকতে চায়, তবে প্রজা হিসাবেই থাকতে হবে। সুতরাং, ফিরিঙ্গিরা স্থির করল স্থানীয় জমিদারদের অনুরোধ উপরোধ না করে বরং আরও উপর মহলেই দরবার করা যাক। তারা কালবিলম্ব না করে ওয়েলস নামে একজন সাহেবকে পাঠিয়ে দিল বর্ধমানে। এসেছেন তখন অনেক আরমানি বণিক। ইংরেজদের চেয়ে মুঘলদের ঘরের খবর তারা বেশি জানে। বাদশা থেকে শুরু করে বাদশাজাদাদের স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন সম্পর্কেও তারা অবহিত। সুতরাং, পথ-প্রদর্শক এবং মন্ত্রদাতা হিসাবে ওয়েলস-এর সঙ্গে দেওয়া হল খোজা শারহেদ নামে এক আরমানিকে। লক্ষ্য —কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের জমিদারি আদায়। ওরা জানে, সুবাদারের অধিকার নেই একজনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এই জমিদারি অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার। কিন্তু আজিম উশ্বান সুবাদার মাত্র নন, তিনি বাদশাহের পৌত্র। সুতরাং, বাদশার তরফে তাঁর অধিকার আছে যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের।

ওরা স্বভাবতই শূন্য হাতে বর্ধমানে পৌঁছায়নি। ওরা জানত হিন্দুস্থানে তখন ঘুষের রাজত্ব। টাকায় এখানে সব হয়। তাছাড়া আরও একটা ঘটনা জানা ছিল ওদের। সেটা এই, হিন্দুস্থানে উপর মহলে বিদেশি জিনিসপত্রের বড়োই কদর। (সেই পুরোনো ব্যাধি আজ নীচের দিকেও সম্প্রসারিত, এই যা।) সুতরাং, ওদের সঙ্গে ছিল বিলাতি বন্দুক, বিলাতি কাপড় এবং টুকিটাকি নানা উপহার। শুধু বাদশাজাদাকে দিলে চলবে না, আশপাশের আমলাদেরও খুশি রাখতে হবে। সেই খাতে বরাদ্দ ছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। শাহজাদার এক পুত্র এবং কিছু কিছু আমলা তাতে খুশি হলেন না। বললেন—আমরা ক'খানা পিস্তল চাই, আরও বিলাতি কাপড় চাই, একটি ঘড়ি চাই, ব্র্যান্ডি চাই, সোডা-ওয়াটার চাই। কোম্পানির